<u>তথ্যপঞ্জি</u>

ভুমিকাঃ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন **"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার : সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার"** এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষ উদযাপন করতে যাচ্ছে।

মানবাধিকার সর্বজনীন। বঙ্গবন্ধু আজীবন মানবাধিকারের জন্য নিবেদিত ছিলেন। তৃনমূল হতে কেন্দ্র পর্যন্ত দেশব্যাপী মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানুষের অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত জরুরি। এলক্ষ্যে **'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার'** শিরোনামে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাধ্যমিক স্কুল,কলেজ ও মাদ্রাসা) নবম ও দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি ও সমমানের ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন/সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মানবাধিকার বিষয়ক ধারণা দেয়া এবং বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকে কীভাবে মানবাধিকার সুরক্ষা ও সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করেছেন সে সম্পর্কিত তথ্য সংযুক্ত করা হল।

দেশের সকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাধ্যমিক স্কুল,কলেজ ও মাদ্রাসা) নবম ও দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি ও সমমানের ছাত্র-ছাত্রীরা এই রচনা প্রতিযোগিতায় অনলাইন/সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে।

<u>জেলা বাছাই কমিটি</u>

১	জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
২	জেলা পর্যায়ের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	(২ জন) সদস্য
৩	জেলা বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	(২জন) সদস্য
৪	কারিগরি ও মাদ্রসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাধ্যমিক সমমান হতে ১জন ও উচ্চমাধ্যমিক সমমান হতে একজন) শিক্ষক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	(২জন) সদস্য
৫	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

সংশ্লিষ্ট জেলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বোদ্ধা এমন দুইজন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে আহ্বায়ক প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে।

প্রতিযোগী বাছাইয়ের নির্দেশিকা

করোনা দূর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে শিক্ষার্থীগণ অনলাইনে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ইমেইল বা অন্য কোন মাধ্যমে রচনা জমা দিবেন। অনলাইনে অংশগ্রহন করা সম্ভব না হলেও সে নিজ হাতে লিখে হার্ডকপি স্ব-স্ব বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে পারবে। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সংগৃহিত রচনাবলী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবর জমা দিতে পারবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবেন।

১. নবম ও দশম (সমমান) শ্রেণীর প্রতিযোগী সমন্বয়ে ‘ক’ গ্রুপ সর্বোচ্চ ৭০০ শব্দে রচনা লিখবে;
২. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী (সমমান) প্রতিযোগী সমন্বয়ে ‘খ’ গ্রুপ সর্বোচ্চ ১২০০ শব্দে রচনা লিখবে;
৩. প্রতিযোগিতার তারিখঃ ১৫/১০/২০২০
৪. উপজেলা প্রশাসন হতে প্রতিটি স্কুল,কলেজ,মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা প্রেরণ করবে;
৫. প্রতিযোগীরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রচনা লিখবে।
৬. উত্তরপত্রের উপরের অংশে প্রতিযোগীর নাম, বয়স, মোবাইল নাম্বার, শ্রেণি, রোল নাম্বার, প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে হবে।;
৭. জেলা পর্যায়ে অনলাইন বা সরাসরি লেখা প্রতিটি উত্তরপত্রে পরিদর্শকের স্বাক্ষর থাকতে হবে;
৮. জেলা বাছাই কমিটি তথ্য সংগ্রহ ছক (সংযুক্ত) পূরণ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ইমেইলে info@nhrc.org.bd প্রেরণ করবে;
৯. জেলা বাছাই কমিটি প্রতি উপজেলা হতে প্রাপ্ত উভয় গ্রুপের রচনাসমূহ বাছাই করে সেরা (১০+১০) ২০টি রচনা নির্বাচনপূর্বক সীল গালা করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে প্রেরণ করবে;
১০. কমিশন কর্তৃক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে মোট (৬৪ X ১০= ৬৪০+ ৬৪ X ১০=৬৪০) ১২৮০টি রচনার মধ্যে প্রথম ধাপে (৫০+৫০) ১০০টি রচনা বাছাই করা হবে;
১১. বাছাইকৃত (৫০+৫০) ১০০টি রচনা নিয়ে কমিশন ‘নতুন প্রজন্মের মননে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার’ শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করবে;
১২. বাছাইকৃত ১০০টি রচনার প্রতিযোগীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার বিষয়ে অনলাইনের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। জেলা প্রশাসকগণ অনলাইনে প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে কমিশনকে সহায়তা করবেন। কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উভয় গ্রুপ থেকে সেরা ১০+১০ মোট ২০ জন প্রতিযোগী নির্বাচন করা হবে।
১৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে আগামি ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ‘মানবাধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানে রচনা প্রতিযোগিতার সংখ্যাধিক্যের উপর ভিত্তি করে প্রতি বিভাগ থেকে তিনটি সেরা উপজেলা ও একটি শ্রেষ্ঠ জেলাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে।
১৪. সেরা ২০ জন প্রতিযোগীকে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পুরষ্কার ও সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে;
১৫. উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেট ও মানবাধিকার কমিশনের লোগো সম্বোলিত কলম প্রদান করা হবে।

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার”

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

‘বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার’ রচনা প্রতিযোগিতা

তথ্য সংগ্রহ ছক

গ্রুপ	প্রতিষ্ঠানের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বয়স	বালক	বালিকা	অন্যান্য	মোট
ক গ্রুপ							
খ গ্রুপ							

উপজেলাঃ

জেলাঃ

স্বাক্ষর

বি.দ্রঃ ‘বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় মোট কত সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে সেই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ছক পূরণ করে তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের উল্লেখযোগ্য তথ্যপঞ্জি

- নাছিমা বেগম

জন্ম, নামকরণ ও পরিচয়:

বিশ শতকের প্রথমভাগে ফরিদপুর জেলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রেসিডেন্সির অধীন। সেসময় বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা ছিল একটি বাজার, আর টুঙ্গিপাড়া ছিল একটি অজপাড়া গাঁ। মধুমতি নদীর শাখা বাইগারের তীর ঘেষে এই গাঁ এর অবস্থান। পাখীর কল-কাকলীতে মুখরিত শ্যামল ছায়াঘেরা বৃক্ষরাজী পরিবেষ্ঠিত এই গাঁয়েই স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। দিনটি ছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান। মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয়। বাবা-মা আদর করে খোকা নামে ডাকতেন। নানা শেখ আব্দুল মজিদ আকিকা দিয়ে নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং বলেছিলেন একদিন এই শিশুর জগৎজোড়া নাম হবে। টুঙ্গিপাড়ার মধ্যবিত্ত শেখ বংশ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার হিসেবে এ অঞ্চলে বেশ পরিচিত ছিল। তাঁদের ছিল গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ। সংসারে অভাব কাকে বলে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের জানা ছিল না।

শৈশব: বঙ্গাবন্ধুর শৈশবের অধিকাংশ সময়ই কাটে টুঙ্গিপাড়ায় মায়ের সাথে। বাবা মায়ের আদরের খোকা শৈশব থেকেই একদিকে ছিলেন ভীষণ ডানপিটে ও জেদী, অন্যদিকে ছিলেন নির্ভীক, অধিকার সচেতন ও জনদরদি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। শিশু বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রের মধ্যে পরোপকারীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর নিদর্শন পাওয়া যায়।

শিক্ষাজীবন:

খোকার লেখাপড়ার হাতেখড়ি বাড়িতে গৃহশিক্ষকের নিকট। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় সাত বছর বয়সে।

১৯২৭ সালে স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৯২৯ সালে নয় বছর বয়সে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৯৩২-১৯৩৪ সালে অসুস্থতার কারণে পড়াশোনার সাময়িক ছেদ ঘটে। এই সময় তিনি বেরিবেরি রোগ এবং পরবর্তীতে চোখের গ্লুকোমায় আক্রান্ত হন। ষোল বছর বয়স থেকেই তিনি চশমা পড়েন।

প্রায় দুই বছর কলকাতায় চিকিৎসা শেষে সুস্থ্যহয়ে ১৯৩৫ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন।

১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি কলকাতার বেকার হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন।

১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায়ের আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীগণ তাঁর নেতৃত্বে ধর্মঘটের ডাক দিলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন। এই বহিষ্কারের ৬১ বছর পর ২০১০ সালের ১৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবৈধভাবে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

বিবাহ:

তিন বছর বয়সে চাচাতো বোন শেখ ফজিলাতুন্নেসা রেণু পিতার মৃত্যুর কারণে মুরুব্বীর হুকুম মানার জন্যই মুজিবের সাথে বিবাহ হয়। তখন তারা বিবাহের কিছুই বুঝতেন না। রেণুর বয়স তখন তিন এবং মুজিবের বারো। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র পৃষ্ঠা-২১পাঠে জানা যায়, ১৯৪২ সালে তাঁদের ফুলশয্যা হয়। রেণু-মুজিবের দাম্পত্য জীবন ছিল ৩৩ বছরের। তাদের তিন পুত্র এবং দুই কন্যার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্যেষ্ঠ সন্তান।

নেতৃত্বের বিকাশ: শৈশবেই শেখ মুজিবের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যা তাকে বড় হয়ে একজন দেশ নেতা হতে সাহায্য করেছে। স্কুলের যে কোন উৎসব আয়োজন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুজিবের ডাক পড়তো সবার আগে। সহপাঠীদের সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় মুজিব ভাই। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসিকতা, স্পষ্টবাদিতা ও আদর্শের জন্য কিশোর মুজিব স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৩৮ সালে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুলের ছাত্র থাকাকালে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসেন। এসময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে তাঁদের সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এসময় কিশোর মুজিব স্কুলের ছাদ থেকে পানি পড়া এবং ছাত্রাবাসের সমস্যা তাঁদের নিকট তুলে ধরে তা আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৪০ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সালে কলকাতায় ফরিদপুরবাসীর উদ্যোগে গঠিত 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী ভূমিকার বিরোধিতা করে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। ৪ঠা জানুয়ারি গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। নবগঠিত এ দলের অন্যতম দাবি ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে ঘোষণা দিলে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা শেখ মুজিবকে ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালন কালে সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। প্রবল ছাত্র আন্দোলনের মুখে তাকে মুক্তি দেয়া হলেও বিভিন্ন অজুহাতে দফায় দফায় তাকে গ্রেফতার এবং কয়েকবার কারামুক্তির পর ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ মুজিবকে গ্রেফতার করে প্রায় দুই বছর জেলে আটক রাখা হয়। একটানা কারারুদ্ধ হয়ে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি অবস্থায় অনশন ধর্মঘট পালন করলে স্বৈরাচারী পাকিস্তানের সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৫৩ সালের ৯ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আর এভাবেই তাঁর নেতৃত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে। জেল জুলুম অত্যাচার কোন কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। তিনি হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির জাতির পিতা। তার নেতৃত্বেই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের বিকাশ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন যাত্রা সূচিত হয়। পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জেল জীবন:

কারা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত '৩০৫৩ দিন' বইটি জাতির পিতার সমগ্র জেল জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। এই বইয়ের তথ্যসূত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৩৮ থেকে ১৯৭২ এর মধ্যে তিনি ১৭ বার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে মোট ৩০৫৩ দিন তাঁর যৌবনের ৮ বছর ৪ মাস সময়ের বেশী আটক ছিলেন। কারাগারে আটক অবস্থায় বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং আমার দেখা নয়াচীন এই তিনটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ গুলো পাঠ করে আমাদের আগামী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন:

১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৪ই মে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সালের ৫ই জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫ আগস্ট তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বিভিন্ন দাবি গণপরিষদে উপস্থাপন করেন। ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং তিনি পুনঃ দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প বাণিজ্য শ্রম ও দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭ সালে সংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর গ্রেফতার হন।

১৯৬০ সালের ১৭ ডিসেম্বর মুক্তি পান । রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল, স্বাভাবিক চলাফেরায় নিষেধ ছিল।

১৯৬১ সালে বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রতি মহকুমা ও থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬৪ সালের ১১ই মার্চ বঙ্গাবন্ধুর উদ্যোগে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

১৯৬৬ সালে বঙ্গাবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন এবং ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ শুরু করেন। বঙ্গাবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেপ্তার হন। মূলত এই ৬ দফা পাকিস্তানি স্বৈরাচারী সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেয়।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে বঙ্গাবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গাবন্ধু সহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গাবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এবছরই ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গাবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’।

১৯৭০ সালের ৬ই জানুয়ারি বঙ্গাবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৭ ও ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের

মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করলেও পাকিস্তানিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করা হয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ২০১৭ সালের অক্টোবরে ভাষণটি ইউনেস্কো থেকে "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য" হিসেবে স্বীকৃতি পায় যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০টি ভাষণের মধ্যে অন্যতম।

১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাত ১২.২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাত ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং তিন দিন পর তাকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ লালপুর জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার অনুষ্ঠিত করে তাকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেদিনই বঙ্গবন্ধু ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান। লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ৯ জানুয়ারি দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। দিল্লি বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। ১০ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় পৌঁছালে রেসকোর্স ময়দানে তাঁকে অবিস্মরনীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১২ ই জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হলেও তা পূরণ হবার আগেই সেনাবাহিনীর একদল উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট কালরাতে নিজ বাসভবনে তিনি সপরিবারে নিহত হন যা বাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। বাঙালি জাতি এই দিবসটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে।

মানবিক গুণাবলী: শিশু বয়সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের চরিত্রের মধ্যে পরোপকারী বৈশিষ্ট্য ও মানবিক গুণাবলীর পরিস্ফুটন ঘটেছে। কোন অসহায় লোক তার কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে পায়নি এমন নজির নেই। মানুষের দুঃখ কষ্টে আমৃত্যু তার মন কেঁদেছে।

বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ এনামুল হক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" শিরোনামে একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "দশ বছরের মুজিব নিজেদের অংশ হইতে জনৈক গরিব প্রজাকে চাউল দিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, বাবা আমাদের মত ওদেরও তো ক্ষুধা আছে।" বঙ্গবন্ধুর কৈশোর জীবনে এধরনের আরো অনেক ঘটনা আছে। যেমন- একদিন মিশন স্কুলের শিক্ষক, রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফেরার পথে খালি গায়ে এক ছেলেকে দেখে তিনি নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আর একদিন ঝুম বৃষ্টিতে একজন বৃদ্ধ মানুষকে ভিজতে দেখে কিশোর মুজিব তার নিজের ছাতা তাকে দিয়ে ভিজতে ভিজতে বাসায় যান। শিশু মুজিবের মনে এই যে মানুষের প্রতি দরদ তা কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময় কাজী আব্দুল হামিদ মাস্টার সাহেব ছিলেন কিশোর মুজিবের গৃহশিক্ষক। মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে মুসলিম সেবা সমিতি গড়ে তোলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন মুজিবকে প্রভাবিত করে। তিনি অন্যদের সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষার চাল উঠাতেন গরিব ছেলেদের সাহায্য করার জন্য। ১৯৩৭ সালে মাস্টার সাহেবের মৃত্যুর পর কিশোর মুজিব মুসলিম সেবা সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৪৩ সাল (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশে শুরু হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১০ টাকা মনের চাল বিক্রি হয় ৫০ টাকায়। প্রতিদিন অনাহারে মানুষ মারা যায়, রাস্তায় পড়ে থাকে। কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সঙ্গে মুসলিম লীগের যুবকর্মীদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিতে যোগদান করেন শেখ মুজিব। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যার্থে লেখাপড়া ছেড়ে গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন। গোপালগঞ্জেও তিনি ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ আহুত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে সূচিত কলকাতা ও বিহারে দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাঁড়ান শেখ মুজিব। শরণার্থী ও মোহাজেরদের সাহায্যার্থে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং তাদের থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। আর এসব মানবতাবাদি চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য তিনি দিনে দিনে হয়ে উঠেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাঙালি জাতির পিতা।

মানবপ্রেমী বঙ্গবন্ধুর মানুষের প্রতি অসামান্য দরদ ছিল। ছোট-বড়, ধনী-গরিব নির্বিশেষে তিনি সবাইকে ভালোবাসতেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও তিনি তাঁর মানবপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী সেলিম (আব্দুল) ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দেয়াকালে আব্দুল উল্লেখ করেন, দুইজন কালো পোশাকধারী তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তার হাতে এবং পেটে গুলি লাগে। গুলি খেয়ে তিনি দরজার সামনেই পড়ে যান। পরে সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখেন ৪/৫ জন আর্মির লোক বঙ্গবন্ধুকে তাঁর রুম হতে ধরে সিঁড়ির দিকে নিয়ে

যাচ্ছে। যাবার সময় বঙ্গবন্ধু তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, 'ঐ ছেলেটা ছোটবেলা থেকে আমাদের এখানে থাকে, একে কে গুলি করলো?' এইরকম একটা অচিন্তনীয় ভীতিকর পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধুর মন কেঁদে উঠেছিল কাজের ছেলে আব্দুলের জন্য। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও পিতার মতোই মানব দরদী একজন মানুষ। তিনি মানবতার জননী হিসেবে আজ ভুবনখ্যাত। তিনি তাঁর সকল কাজের মাধ্যমে অসহায়-দরিদ্র-দুস্থ- প্রতিবন্ধী ও হিজড়া সকলকে ছায়ার মত আগলে রাখতে চান।। অসহায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে তিনি মানবিক বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে প্রতিপালন করেছেন।

বর্তমানে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা অনাচার তৈরি হয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ সৃজনের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকলের মাঝে মানবাধিকার সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে আজকের ছাত্রছাত্রীরা একযোগে কাজ করলে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পাশাপাশি মানবিক বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে পরিচিত করতে সমর্থ হবো। মানবিক বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে যাবে এটাই প্রত্যাশা। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ অঙ্গীকার সুরক্ষিত হবে মানুষের অধিকার।

<u>তথ্য সহায়িকাঃ</u>

০১। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান

০২। কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমান

০৩। আমার দেখা নয়াচীন, শেখ মুজিবুর রহমান

০৪। ৩০৫৩ দিনঃ জাতির পিতার সমগ্র জেল জীবন, কারা সদর দপ্তর

০৫। বঙ্গবন্ধুর জীবনঃ কালপঞ্জি, আয়েশা হক

০৬। https://www.bbc.com/bengali/mobile/news/2010/08/100814_mrkmujib.shtml

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র- ১৯৪৮

১. জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২. কারো প্রতি কোন বৈষম্য নয়
৩. স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪. কোন প্রকার দাসত্ব নয়
৫. নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬. মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭. আইনের চোখে সবাই সমান
৮. বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯. বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০. নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১. আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪. নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫. জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬. বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮. ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
২০. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১. গণতান্ত্রিক অধিকার
২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩. স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেয়ার অধিকার
২৪. বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির অধিকার
২৬. সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭. মেধাসত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮. মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯. অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০. মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন :

অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন এই দুটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়না।

অপরাধ: আইনে শাস্তিযোগ্য সব কর্মকান্ডই অপরাধ। যেমন- জোরপূর্বক কারো সম্পত্তি দখল, কাউকে আঘাত বা নির্যাতন করা, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অপরাধ। এইসব অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই একজন মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে যায় না।

কখন মানবাধিকার লংঘিত হয়: কোন অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে যেমনঃ পুলিশ, ডাক্তার, আইনজীবী, বিচারক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা দপ্তর/ সংস্থা যদি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পক্ষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় না। কিন্তু যদি তারা তা না করে দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পক্ষের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। যেমনঃ যদি কোন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়ে থানায় মামলা করতে গেলে থানা যদি মামলা না নেয় বা মামলা নিতে গড়িমসি করে বা ঠিকমত তদন্ত না করে গাফিলতি করে বা বিচার প্রার্থীর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ বা হয়রাণী করে তাহলে ওই গৃহকর্মীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।